বধূবরণ

নিয়তি রায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

হার	.....	৭
কুড়ানি	.....	১১
খুন	.....	১৫
নিষাদ	.....	২১
বেহুলা	.....	২৫
মানুষ	.....	৩০
উচ্ছেদ	.....	৩৪
নবজন্ম	.....	৩৯
চরুয়া	.....	৪৫
চা বাগিচার কলিটি	.....	৫০
অপেক্ষা	.....	৫৫
সানাই	.....	৬২
নীল আসমান	.....	৬৬
লক আউট	.....	৭০
অচেনা পাখি	.....	৭৬
স্বয়ংসিদ্ধা	.....	৮৩
বধূবরণ	.....	৮৮

হার

আজিমুদ্দিন চাচা আমাদের জমির ভাগচাষ করত। বাবা বলত, আজমুদ্দিনের মত সৎ মানুষ অনেক খুঁজেও পাওয়া যায় না। তা নইলে দেশে যখন বর্গাদারস্বত্ত্ব চালু হল, গ্রামে গ্রামে পার্টির মানুষ এসে বর্গাদার প্রথা চালু করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, তখনও আজিমুদ্দিন চাচা নির্বিকার ছিল। বাবা বলে, কি রে আজিম তুই কি করবি? জমির বর্গাদার নাম লেখাবি, না, এমনি চাষ করবি? চাচা বলত,'ভাইজান, তুমি আমি য্যাদ্দিন আচি এইগুলান বিশ্বাস করি না।' বাবা চাচার পিঠ চাপড়ে বলত, আজিম তুই আমার নিজের ভাইয়ের চেয়েও বেশি। চাচা বলত, কত মাইনষে কত কিছু কয়। সগ্গলি কয় আমি বোকা। ভাগচাষের নাকি আলাদা একটা দাম আচে। জমির একরকম দখলিস্বত্ত্ব। চাচা বিড়বিড়িয়ে বলত, ভাইজান, তুমার আমার যে সম্পক্ক সিডার কুন দাম নাই? বাবা বলত তোর আমার রক্তের সম্পক্ক নাই ঠিকই কিন্তু আমরা চিরদিনের ভাই।

আজিমুদ্দিন চাচার শরীরে অসুরের মত শক্তি ছিল। আমাদের বাড়ির উঠানে চাচা ধান মাড়াই করত। গরুর মুখে ঠুলি দিয়ে ধানের ওপর দিয়ে ঘোরাত। মাঝে মাঝে আমিও চাচার পেছন পেছন ঘুরতাম। চাচা বলত, যা সোনামা, রইদে থাকে না, শরীল পুড়বে। অনেক বেলা পর্যন্ত চাচা রোদে কাজ করত। বাবা বলত, আজিম বেলা হল নাওয়া খাওয়া কর ভাই। চাচা কাজ করতে করতে উত্তর দিত, কাম আধ খাচরা কইরা রাখতে আমার ভাল লাগে না। এক্কেবারে কমপিলিট কইরে খাব। ও বেলা দক্ষিণের পুঁজিটা ধইরব। নিজাম ওর বাবাকে ডাকতে আসত,—আব্বা-আম্মা তুমারে খাইতে ডাকে। বাবা তাড়া দেয়—যা আজিম ভাই, তোর কাজটাই আগে। নিজের দিকে কোনদিন তাকালি না।—ভাইজান রোস আরেট্টু। কাম থাইগলে আমার কেন জানি ক্ষিদা পায় না।

শীতের সন্ধ্যায় উঠানের মাঝখানে তরলামাসী আগুন জ্বালাত। সেই আগুনের পাশে চাচা, বাবা বসে আগুন পোহাত। আমিও বসতাম। আমি আগুন ঘাটতাম, চাচা বলত, সোনামা, আগুন ঘাটে না, ধোঁয়া হয়, চোখে জল আসবে। কোন কোন দিন নিজামও আসত। আগুনের পাশে নিজাম চুপচাপ বসে থাকত। কাঠিতে আগুন নিয়ে আমি ওর শরীরে ছুঁইয়ে দেওয়ার ভান করতাম। নিজাম সরে যেত না। রাগও করত না।

আগুনের পাশে চাচা আর বাবা মিলে কত কি যে গল্প করত। চাচা বলত, ভাইজান এবারে তাইচুন ধান লাগবে, মাসৌরী ধানের ফলন ভাল কিন্তু খাইতে বেশী স্বাদ নাই। শেষ পর্যন্ত বাবা চাচার কথাই রাখত।

গ্রামের আরও দু-চার জন মানুষ আসত আগুন পোহাতে। পরাণ কাকা চাচাকে বলত, দেক্ আজুদ্দিন, তুই তো ঠিক ঠিক হিসাবপত্র বুইজে দিস্ আমার। হরিবোলা কয় এখন নাকি ধানের ফলন ভাল হয় নাই। পরাণ কাকা বিড়বিড় করে—খাঁটি বর্গাদার হইচে। যা হিসাব দিব তাই মাইনা নিতে হইব। পাট্টিই সব ডুবাইল। পরাণ কাকা বাবাকে বলত —তুমি কিন্তু খাঁটি মানুষ পাইচ ভাই। তোমার লাক ভাল। তোমার হিসাবপত্তর তুমি ঠিক

ঠিক বুইজে পাও। চাচা এবারে বলত—খাঁটি মানুষ পাইতে গেলে নিজেকেও একটু খাঁটি হইতে হয়। পাট্টির কি দুষ? তুমি যে বচর বচর হালুয়া চেঞ্জ করবা সে কথা কারে কবা। কই ভাইজানের জমিতে আমি কত বচর থিকা চাষ কইরত্যাছি। আর ভাইজানের মত মানুস কয়ডা আছে কও দিনি? ভাতৃত্বের বন্ধনে বাবারই জয় হয়।

আমাদের বাড়িতে জাত পাতের কোন ব্যাপার ছিল না। বাবা আর চাচা এক সঙ্গে দাওয়ায় বসে খেতো। কখনও আমি ও নাজিম পাশাপাশি বসে খেতাম। চাচা আমাদের বাড়িতে সকালে রোজ নাস্তা খেত। কখনও চাচা উঠানের এক কোনায় বসে মুড়ি, গুড় অথবা পান্তা ভাত খেত। নিজামও চাচার পাতে খেতে বসত। আমি পাশে বসে চাচার খাওয়া দেখতাম। চাচা বেশ করে খাবার মাখত, তারপর দলা দলা করে মুখে পুরত। নিজামকেও খাওয়াত। আমার খুব মজা লাগত দেখতে। চাচা বলত—সোনামা, যা তুইও খাইতে বস। আমি বলতাম, চাচা তোমার খাওয়া দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। চাচা অমনি হে হে করে হাসত।

নাস্তা খাওয়া হলে চাচা কাজে যায় আর আমি ও নিজাম ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতাম। নিজাম আমার কাছে সবসময় হেরে যেত। আমার মনে হত নিজাম আমার কাছে ইচ্ছা করেই যেন হেরে যেত। আমি ভীষণ হাততালি দিতাম, নিজামও হাততালি দিত।

নিজামের মুখখানাতে একটা কি যেন খুঁজে পেতাম। ও একটা ছেঁড়া জামা পরে থাকত, তবুও কোথায় যেন একটা স্বর্গীয় সুষমা মুখখানাতে ঢালা। নিজাম একদিন আমাদের বাড়িতে না এলে চাচাকে খুউব বকতাম। চাচা হে হে করে হেসে বলত, কাইল আইসপে সোনামা। এখন তো ওরে ইস্কুলে দিছি, ঘরে বইসে এট্টু বই টই দেখুক।

নিজাম ইস্কুলে যাবে শুনে আমার সে কি আনন্দ। আমিও ইস্কুলে যাই। বাবাও নিজামের ইস্কুলে যাওয়ার খবর শুনে চাচাকে বলে—কি রে আজিম ছেলেকে ইস্কুলে দিলি? ভাল ভাল। এক আধটু লেখাপড়া না শিখলে কি চলে? চাচা বলে, ছেইলেটা লেখাপড়া শিখলে আমার জেবন সাথক হয়। য্যাদ্দূর পারি পড়াব। জেবন থাইগতে পড়াব। কিছুদিন পরে চাচা এসে বলে—নিজাম ভাল ফল কইরল এবার। মাস্টোর কয় নিজামুদ্দিন একদিন নিশ্চয়ই বড় হইব। চাচা হে হে করে হাসে। আমিও খুশি হতাম।

নিজাম একটা ছেঁড়া জামা পরে থাকত বলে আমার খুব কষ্ট হত। আমি ভেবে পেতাম না নিজামের কেন আর জামা নেই। ছেঁড়া জামাতেও ওকে ভারী সুন্দর দেখাত। বিশেষ করে ওর নির্বাক চাহনি। আমি চাচাকে বলতাম—চাচা ওকে একখানা নতুন জামা কিনে দাও না! চাচা হেসে বলত,—দেব সোনামা দেব, ঈদের সময় দেব। আমি বায়না করে বলতাম—চাচা তুমি যেন কী? নিজামকে একটা নতুন জামা কিনে দিতে পার না! চাচা হে হে করে হাসে। পরে অবশ্য বাবাই নিজামকে একটা নতুন জামা কিনে দিয়েছিল। নতুন জামা পরে নিজাম আমাদের বাড়িতে আসতে লজ্জা পেত। আমি বলি নিজাম তোকে না নতুন জামাতে বেশ লাগছে। চাচা কোথা থেকে এসে বলে, সোনামা জামাডা পরতিই চায় না, তর চাচী জুর কইরে পরাল। তা শুনে নিজাম ছুটে পালায়। আমিও বুঝে উঠতে পারিনি কেন নিজাম নতুন জামা পরতে চায় না।

আমি তখন কিশোরী। গতিবিধির সীমারেখা টানা হল। মা বলে, যেখানে সেখানে একা একা যাবি না মামনি। ইতিমধ্যে গ্রামে লেখাপড়ার পাঠ চুকে যায়। শহরের ইস্কুলে আমার ভর্তি করা হল। আমার বুকে কোথায় যেন একটা ভারী পাথর চেপে বসে। মা, বাবা, আজিমুদ্দিন চাচা, তরলা মাসী আর নিজাম সকলে আমার চোখের আড়ালে থাকবে এ আমি ভাবতেই পারি না। বিশেষ করে নিজামের সঙ্গে আর ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতে পারব না। তাই দু'ফোঁটা অশ্রু অজান্তেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

তরলা মাসী আমার চুল বেঁধে দেয়। চুল বাঁধতে বাঁধতে তরলামাসী আমায় বললে, —জানিস্ মামনি, নিজাম না ভাল বাঁশী বাজায়। একদিন বাড়িতে ডাইকা আইনা ওর বাঁশী বাজান শুইনব। ছোড়ার যা লজ্জা। তরলা মাসীর মুখে এই প্রথম ওর বাঁশী বাজানোর কথা শুনলাম। আমি বলি—মাসী নিজাম কি সুন্দর না? মাসী আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, ছোঁড়াকে বাঁশী হাতে এক্কেবারে কেষ্ট ঠাকুরের মত দেখা যায়। তরলা মাসীর মুখে নিজামের প্রকৃত রূপ বর্ণনা আমার মনে ধরে। সেই সঙ্গে সারা বুক জুড়ে আনন্দের জোয়ার আসে।

চাচাকে একদিন বলি, চাচা নিজামকে আর শহরে পড়াতে পাঠাবে না? চাচা হে হে করে হেসে বলে না সোনামা। আমরা গরীব মানুষ, কেমন করে পড়াই কও দিনি? আমি বুড়া হচ্চি, কয়দিন পর তুমাদের জমিনগুলা নিজামই চাষ করবে। চাচার মুখে একথা শুনে আমার বুকে ভারী পাথরটা আরও জোরে চেপে বসে। আমি মনে মনে বলি বাবা সেবার যেমন নিজামকে একটা জামা কিনে দিয়েছিল সেরকমই কেন ওকে শহরে পড়তে পাঠায় না। বাবার তো কত আছে। চাচাকে বলি,—চাচা নিজাম তাহলে আর পড়বে না? ও তো ভাল ফল করেছিল। পড়াও না কেন ওকে? চাচা খানিকক্ষণ থেমে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে সেইজন্যই তো ছেইলেটা কেমুন জানি হয়া গেল, ভাল কইর‍্যা কতা টতা কয় না।

আমার শহরে যাবার সময় ঘনিয়ে এল। দুপুরবেলা একা বেরিয়ে পড়ি। এক পায়ে দু'পায়ে নিজামদের বাড়ির দিকে যাই। নিজাম বাড়িতেই ছিল। আমায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমি খানিকক্ষণ ও পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বলি—নিজাম ছোঁয়াছুঁয়ি খেলবি? অপরপক্ষে নিরুত্তর। এবারে আমি বলি—জানিস নিজাম, আমি কয়দিন পর শহরে চলে যাব। আমি এবার শহরের ইস্কুলে পড়ব। এবারে নিজাম চমকে ওঠে। তর শুনে ভাল লাগছে না? নিজাম এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। শুনশান দুপুরে দু'জনে দুজনার দিকে তাকিয়ে থাকি। চারদিক নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শুকনো পাতা ঝরার শব্দ ভেসে আসে। হঠাৎ নিজাম ওদের বাগান থেকে একটা কাঠমালিকা ফুল তুলে এনে আমার চুলে গুঁজে দিয়ে ছুটে পালায়। আমিও বাড়ির দিকে পা বাড়াই। এক অভূতপূর্ব ও অনাবিল আনন্দ হয় যা মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। এ যেন অনাঘ্রাতা বনকুসুমের মত সুন্দর, শরতের আকাশের মত স্নিগ্ধ কিশোরীর মনে প্রথম পুরুষ হৃদয়ের সুরের স্পর্শ। সেদিনই উপলব্ধি করি আজিমুদ্দিন চাচা আর বাবার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যতই অটুট থাক না কেন,

কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড কাঁটাতারের প্রাচীর রয়েছে আর তা টপকে নিজাম কোনদিনই আমায় ছুঁতে পারবে না। তাই বুঝিবা নিজাম সববারের ছোঁয়াছুঁয়ি খেলায় হেরে যেত ইচ্ছে করেই।

আমার রূপে তখন জোয়ার। ইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকি। বাবা দিশেহারা হয়ে আমার জন্য সুপাত্র খুজছে। একদিন শুনি সাগরপারের রাজপুত্তুর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে টগবগিয়ে এসে আমায় নিয়ে যাবে। আমার মনের গোপন জায়গায় লুকান স্বর্ণখনি আজিমুদ্দিন চাচা, তরলামাসী, নদী, বন, মেঠোপথ আর নিজামকে দেখতে গ্রামে ছুটে আসি।

পরিবর্তনশীল জগতের স্বাভাবিক নিয়মে সব কিছুই রূপ বদলেছে। আমাদের জমি জমা সব বিক্রি হয়েছে। চাচার খোঁজ করি। তরলামাসী বৃদ্ধা হয়েছে। তরলামাসী বলে, আজিমুদ্দিন আর বাঁচপে না, ওর সারা শরীলে রোগ হইচে। নিজামের কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

চাচার বাড়িতে যাই। চাচা অনেক কষ্টে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমায় চেনবার চেষ্টা করে।—কেডা আমার সোনামা নাকি? ভেউ ভেউ করে কাঁদে আজিমুদ্দিন চাচা। —এখন আর কয়ডা দিন আচি। সোনামা তর সাতে দেকা হবে ভাবিনি। মনডা চাতিছিল তরে দেখতি। সোনামা আমার সব শেষ, এখন খালি দিন গুনতিচি।

আমার চোখ চারদিকে খুঁজে ফেরে। কি যেন খোঁজে, কাকে যেন দেখতে চায়। খানিক পর চাচাই বলে—তর চাচীডা মরার পর নিজাম একদিন বাড়ি থেকে উধাও হল। মনে হল আমার কাছে এটা নতুন কোন খবর নয়। আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় গেছে চাচা? জানি না, জানি না। সকলে বলে—নিজাম পাগল হইচে। আমি নিজের মনে বলি—নিজাম পাগল হয়নি। নিজাম কোনদিন পাগল ছিল না। নিজাম যে কি আমি তা জানি।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসি। কাঠমালিকা গাছটার দিকে চোখ পড়ে। মনে হল সব কাঠমালিকা ফুল ঝরে পড়েছে। নিজামের দেওয়া সেই কাঠমালিকা ফুলটা অনেকদিন পর্যন্ত রেখেছিলাম। শেষে কোন এক বইয়ের পাতায় গুঁজে রেখেছিলাম। খুঁজলে এখনও সেটিকে পাওয়া যাবে। মনে পড়ে গেল নিজাম আর আমি ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতাম। সববারেই নিজাম হেরে যেত কিন্তু এবারের খেলায় আমারই মস্ত হার হল।

আমার বাবা আর আজিমুদ্দিন চাচার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে চাচারই হল মস্ত জয়। বাবার মহত্বে মস্ত কালির রেখা পড়ে। বাবা সব জমি বিক্রি করে দিয়েছে। চাচা বর্গাদারীস্বত্ত্ব দাবি করেনি। দাবি করলে হয়ত বা চাচার এ অবস্থা হত না। আজ এই অর্ধভুক্ত মানুষটির দিকে তাকান যায় না। মুখের সেই হাসিটা এখনও অটুট। আমার হাত পা শিথিল হয়ে আসে। বাড়ির রাস্তা ধরি। পরাজয়ের বিরাট বোঝাটা এত ভারী লাগে আগে বুঝিনি কখনও। আকাশের দিকে তাকাই। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সামনে সব কিছু ধূসর লাগে। পরাজয়ের গ্লানি তিক্ত অনুভূতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

কুড়ানি

স্টেশনের আলোর ঝরণা, জনতার কলরব, গাড়ির আনাগোনায় কুড়ানির দোলা লাগা মনে অজানা আনন্দ আসে। সামান্য মূলধনের জিনিস অথচ কয়েকমাসে অনেক লাভ। কিছুদিন আগেও কুড়ানি এখানে সেখানে জিনিস কুড়াত। কারও আম, কারও নারকেল, বনের শাক আরও কত কি। অথচ পাকাপোক্ত ব্যবসা হতে দেরি হল না।

কুড়ানি খুশী মনে স্টেশনের মানুষ দেখে। গাড়ীর আনাগোনা দেখে। রোজই দেখে তবুও ষ্টেশনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নতুন হয়ে দেখা দেয় কুড়ানির চোখে। কুড়ানির ভাল লাগে। তবু আজ একটু বেশি ভাল লাগছে কুড়ানির। ভাল লাগার বিশেষ কোন কারণ নেই। তবু বসন্তের ফোটাফুলের মতই ওর ঠোঁটের হাসির ঝিলিক।

স্টেশনে বসে কুড়ানির ঝিমুনি আসে। বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। নানি ছিল, সেও দিন পনের হল মরেছে। নানির কথা মনে আসাতে কুড়ানি খানিক কেঁদে নেয়। দু'চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ে। নানি ওর কেউ না। তবু নানিই তো ওকে কোলে পিঠে বড় করেছে। কুড়ানি কী কোনদিন নানির ঋণ শোধ করতে পারবে? ও জঙ্গলের ধারে পড়েছিল। ভিক্ষেতে বেরিয়ে নানি ওকে কুড়িয়ে পায়। কে যে ওকে ফেলে রেখেছিল জঙ্গলে, হয়ত বা নিজের কলঙ্কের ভার কমানোর জন্যই এ রকমটি করেছে। অথচ নিজের পেটের সন্তান বলে গলা টিপে মারতেও পারেনি তাই কুড়ানি বেঁচে গেছে। আর নানিও খুব যত্ন করে ওকে বড় করেছে। এখন কুড়ানির শরীর ভরা তিস্তার উথালি পাথালি জোয়ার। সৌন্দর্যের ঢল নামা শরীর দেখে নানীর বুক কাঁপে। এত সৌন্দর্যের দরকার ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে নানি দুশ্চিন্তায় পড়ে। কুড়ানির কথা ভেবে ভেবেই হয়ত বা নানি মরে গেল।

নানির কথাগুলি স্পষ্ট মনে পড়ে ওর—'কুন্নি এলা তুই ঘরোতে থাক, কোনদিন কায় তোক নষ্ট করি দেয় মোর ভয় নাগে।' কুন্নি নানির কথায় শুধু মাথা নেড়েছিল। দাওয়ায় বসে থাকা নিপুচি পিসি বলেছিল—এলা উয়াক নিজির উপায় নিজি করির দে, রূপেরও ঠাঁটবাট আচে। নানি পিসির উপর রেগে যায়। গর্জে বলে আমার কুন্নি কি ফেলনা? মাতার উপরা আল্লা আচে, উয়ার দোয়া কি আমার কুন্নি পাইবে না?

এই নিপুচি পিসিই ওকে ব্যবসায় নামায়। পিসিই একদিন ওকে ডেকে বলে—'মাই কুন্নি এইঠে সেইঠে জিনিস কুড়ি বেড়ার বদলে মোর সাতে আয় লাইন ধরে দিম; দুই পাইসা ইনকাম হইবে।'

এরপরই কুড়ানি কাজে লাগে। এ কাজে আনন্দ আছে আর আছে নতুনত্ব। অচেনা জগতের এক ভিন্ন অনুভূতি কুড়ানির মনকে দোলা দেয়।

সবে মূলধন বাড়তে শুরু করেছে। এর মধ্যেই নানি বাধা দেয়। কিন্তু নানি যে আর ভিক্ষেয় বেরুতে পারে না। চোখের দৃষ্টিটাও ঝপসা হয়ে আসছে। দুটো পেট কি করে যে চলবে একথা ভেবে কুড়ানি লাইনে আসা বন্ধ করতে পারেনি। নানি মরে গেল অথচ নানি কুড়ানির কথা রাখতে পারেনি।